গ্রন্থপালের বিদ্যেবুদ্ধি তথা গ্রন্থবে ধ

অণ ঘোষ

মারাঠি রাজনীতিক খাদিলকর লাইব্রেরিয়ান শব্দটির একটি স্বদেশি প্রতিশব্দ করেছিলেন ঃ গ্রন্থপাল। শব্দটি আমারজানা ছিল না। এটি প্রথম গোচরে আনেন শ্র দ্ধেয় অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর এক ব্যক্তিগত চিঠিতে। শব্দটি আমার মন্দ লাগেনি। তা ছাড়া রাজনীতিক - কৃত এই হিন্দিগন্ধী প্রতিশব্দের -পাল শব্দান্ত অন্যবিধ পালেদের, যথা নগরপাল, রাজ্যপাল ইত্যাদির পাশাপাশি বেশ স্বতঃসিদ্ধভাবেই জায়গা করে নেয়। বহু ব্যবহার সত্ত্বেও নগরপাল যদিও পালেদের ক্ষমতা সম্পর্কে যাঁরা সম্যক অবহিত তাঁরা জানেন এই সম্মানীয় শব্দটির এক অন্যতর ব্যঞ্জনাও আছে।

ভারতবর্ষে প্রথম সারির সক্রিয় রাজনীতিকরা যেমন সহজে রাজ্যপাল হতে চান না, মনে হয় যেন এ দেশের শ্রদ্ধেয় বিদ্বজ্জনেরাও তেমনই শুধুমাত্র গ্রন্থপাল পরিচিতির মধ্যে নিজেদের আটকে রাখতে চাননি বা চান না। বাঙালি বিদ্বজ্জনের মধ্যে প্যারিচাঁদ মিত্র (১৮১৪ - ৮৩), রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১), বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২), হরিনাথ দে (১৮৭৭-১৯১১), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৯২-১৮৮৫) নীহারঞ্জন রায় (১৯০৩-৮১) প্রমুখ জীবনের কোনো -না কোনো সময় গ্রন্থপালের কাজে নিজেদের যুক্ত করেছেন, কিন্তু এঁদের মধ্যে একমাত্র প্রভাতকুমার ছাড়া কেউই এটাকে বৃত্তি হিসাবে বেছে নেননি। এবং, মজার কথা, প্রভাতকুমাবের কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থাগারবিদ্যার কোনো প্রশিক্ষণ ছিল না।

প্রতিষ্ঠানিক গন্থাগারবিদ্যার প্রশিক্ষণ অবশ্য প্যারিচাঁদ মিত্র থেকে হরিনাথ দে কারোরই ছিল না। থাকা সম্ভবও নয়। কেননা খোদ ইংলন্ডেই বিবিদ্যালয়কেন্দ্রিক গ্রন্থাগারবিদ্যা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা শু হয় ১৯১৯ -এ ইউনিভারসিটি কলেজ অব লন্ডনে। ভারতবর্ষে তা এসে পৌঁছোয় আরও অনেক পরে। সুতরাং গ্রন্থাগার সংগঠনের যে কাজে তাঁরা যুক্ত হয়েছিলেন তা ছিল বিশুদ্ধভাবেই সমাজকল্যান এবং উনিশ শতকীয় নবজাগরণ না হোক অন্তত এক নব - আলোড়নেরই স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশ। প্রভাতকুমার এই আলোড়নের সীমান্তকালের মানুষ. সীমান্তকালের, কিংবা সঠিকঅর্থে সীমান্ত বহির্ভূত, একান্তভাবেই বিশ শতকের মানুষ ছিলেন নীহ াররঞ্জন রায়। নীহাররঞ্জনের কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থাগারবিদ্যার প্রশিক্ষণ ছিল। লন্ডন বিবিদ্যালয়ের ইতিহাস অধ্যয়ন করতে গিয়ে একটা শিক্ষাবর্ষ তাঁকেঅপেক্ষা করতে হয়েছিল এবং অপেক্ষার সেই বর্ষটিতে তিনি গ্রন্থাগারবিদ্যার পাঠটি নিয়েছিলেন। এমনকী কলকাতাবিবিদ্যালয়ে তাঁর কর্মজীবনের সূত্রপাতও বিবিদ্য ালয়ের গ্রন্থাগারিক হিসাবেই। তথাপি নীহাররঞ্জন গ্রন্থপাল নন, ভারবর্ষের বরেণ্য ঐতিহাসিকদের একজন, যাঁর অতুলনীয় কীর্তি বাঙালীর ইতিহাস।

কিন্তু প্রভাতকুমারও কি গ্রন্থপাল ? ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার সিটি কলেজের গ্রন্থপাল হিসাবে কর্মজীবন শু করে বিভারতী বিবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর সেখানক ার গ্রন্থাগারে দীর্ঘদিন কাজ করে তিনি অবসর নেন। অথচ এইদীর্ঘ অবলম্বিত বৃত্তিটা তাঁর কোনো পরিচয় বহন করে না। রবীন্দ্র - জীবনীকার না বললে প্রভ াতকুমারের পরিচয়েরপনেরো আনা অংশই অন্ধকারে ঢাকা থাকে। শুধুমাত্র গ্রন্থপাল পরিচিতি নিয়ে সাধারণ্যে পরিচিত মানুষ ভারতবর্ষেকেআছেন ? রমন - এফেক্টের বিন্দুবিসর্গ না - জানা শিক্ষিত ভারতীয় সি.ভি. রমনের নাম জানেন, অন্তত বললে বলবেন, হ্যাঁ, নামটা যেন শোনা - শোনা । গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে আন্তর্জা তিক স্বীকৃতি এবং মৌলিক অবদান রাখা সত্ত্বেও এস. আর, রঙ্গনাথনের নাম এই শাখায় ছাত্রছাত্রীদের বাইরে কজন জানেন? স্বাধীন ভারতের প্রথম জাতীয় গ্রন্থ াগারিক হওয়ার সুবাদে বি. এস. কেশবন - এর নাম তবুও কিছুটা জানা।

১৯৭০ -এর দশকে ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগরের জন্য একটি অধিকর্তার পদ সৃষ্টি করা হয়। মনে করা হয়েছিল, জাতীয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থপালের উপরে একজন অধিকর্তা থাকা প্রয়োজন। ওই অধিকর্তা হবেন একজন স্কলার বা পণ্ডিত, যাঁর গ্রন্থাগার পরিচালনায় কোনো প্রশিক্ষণ বা অভিজ্ঞতা আবশ্যিক নয়। তখনই গ্রন্থপাল আর গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের মধ্যে বিতর্ক উঠেছিল এই নিয়ে যে একজন গ্রন্থপালকে স্কলার বা পণ্ডিত হতে হবে কি না, আর হলেও কতখানি। এ বিতর্ক অবশ্য এতদিনেও নিস্পত্তি হয়নি, হবারও নয়। তবে ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারে ১৯৭০ সালের পর থেকে পরপর যে তিনজন পণ্ডিত অধিকর্তার পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথম জনেরপাণ্ডিত্যের সঙ্গে গ্রন্থাগারবিদ্যার প্রশিক্ষণ ও কলকাতা বিবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে কাজ করার অভিজ্ঞতাও ছিল, পরের দুজনের তা ছিল না। তাঁরা খ্যাতনামা শিক্ষক - গবেষক । প্রায় দুই দশকের কাছাকাছি সময় ধরে এই তিনজনপণ্ডিত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে জাতীয় গ্রন্থাগারের কতখানি উন্নতি হয়েছিল তা পরিমাপ করা সহজসাধ্য না হলেও এ কথা বলা চলে যে ওই সময়কালের সম্পূর্ণটাই যদি তাঁরা নিজস্ব ক্ষেত্রে ব্যয় করতেন তাহলে হয়তো আমাদের বৌদ্ধিক জগৎ তাঁদের অবদানে আরও অনেক সমৃদ্ধ হত। সহজে পরিমাপসাধ্য নয় এমন এক কাজের জন্য তাঁদের ডেকে আনা আসলে হয়তো তাঁদের মনের স াধ বাতাসেতে বিসর্জন দিতে বলারই শামিল। কী করতে পারেনতাঁরা গ্রন্থাগারে ? সুষ্ঠু কর্মী পরিচালন ? সে তো যে কোনো ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটে শিক্ষণপ্র াপ্ত ম্যানেজারই করতে পারেন। মূল্যবান বইপত্রের সন্ধান দেওয়া ? সে তো তাঁদের নিজস্ব প্রয়োজনে তাঁরা এমনিই দিয়ে থাকেন।গবেষকদের সাহায্য বা পরামর্শ দান ? সে কাজও তো তাঁদের পেশাগত প্রয়োজনেই অধীনস্থ গবেষকদের জন্য এমনিই করতে হয়। তাহলে গ্রন্থাগারে তাঁদের করণীয় কী ? এ বড়ো জটিল প্র । এবং এই প্রটার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে গ্রন্থপালের কাজের চরিত্র নির্ধারণ, তাঁর সামাজিক ভূমিকা নির্ণয়।

আমার এ লেখার গৌণ উদ্দেশ্য বর্গীকরণ - সূচীকরণ - গ্রন্থপঞ্জি - তথ্যসূত্র - অনুলয় সেবা ইত্যাকার খটখটে পরিভাষা, য সব বিদ্যারই থাকে, তার বাইরে এনে সাধারণের চোখ দিয়ে গ্রন্থপালের কাজটিকে পরিস্কার - পরিচ্ছন্ন করে দেখা, এবং মুখ্য উদ্দেশ্য প্রমাণ করা যে তা এক বিরাট কাজ, কোনো, হেঁজিপেজি লোকের কম্ম নয়। প্রমাণ করাটা খুব দুরূহ হবে না, কেননা আমাদের স্থায়ী সামাজিক প্রত্যয়গুলি --- যেমন, গ্রন্থাগার এক মহৎ প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয় এক মহৎ প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক মানেই বিদ্বান, মুচি মানেই মূর্খ না হোক অন্তত বিদ্বান নয়, ইত্যাদি --- এর অনুকূলে কাজ করবে। এবং এইসব প্রত্যয় ভাঙার বিধবংসী কাজের ধুলোবালির কষ্ট আমার সয় না। অগত্যা গ্রন্থপালেদের বিদ্যেবুদ্ধি তথা গ্রন্থবোধের আলোচনাতেই সরাসরি যাওয়া যাক। যাবার আগে বলে নেওয়া আবর্শ্যক যে কারো বর্তমান বিদ্যেবুদ্ধি বা গ্রন্থবোধের পরিমাণ করার বিপজ্জনক খেলায় আমি নেই ; শুধু অনুচ্চস্বরে উচিত সেই যাবতীয় কথাগুলো বলব, অর্থাৎ কিছুটা উদেশ্যাত্মক ঢঙে এবং উচ্চস্বরে জানাব যে নিশ্চয়ই তা আছে, না থাকলে চলতকী করে এতদিন ? চলছে কী করে এতদিন ?

আলোচনার এই পর্যায়ে এসে গ্রন্থপাল শব্দটিকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি, বাজারচলতি গ্রন্থাগারিক শব্দটাই ভালো, কেননা এতক্ষণে পাঠক না বুঝুন অন্তত আমার হৃদয়ংগম হয়ে গেছে যে গ্রন্থপালের পেশাটা কোনো দিকপালের পেশা নয়। এত বিশাল বাংলা -শিল্প -সংস্কৃতি, তার গল্প-উপন্যাস - সিনেমার চারদিকে এত শিক্ষক, অধ্যাপক, ডাক্তার , ইঞ্জিনিয়ার, এমনকী বেকারও---- কিন্তু কোথাও তেমনভাবে কোনো গ্রন্থাগারিক নেই। শুধু খুব সাম্প্রতিক কালে রামকুমার মুখোপাধ্যায় এক ছোটোগল্পের চরিত্র নঙ্গরচন্দ্র তার গ্রামের গ্রন্থাগারিক বন্ধু প্রভাকর বেজ সম্বন্ধে বলেছিল যে প্রভাকর দেহ রাখার পর থেকে আমার জগৎটি ছোটো হয়ে গেছে। যথার্থ গ্রন্থাগারিকের অভাবে কারো কারো জগৎ হয়তো সত্যিই ছোটো হয়ে যায়। জাতীয় গ্রন্থগার থেকে চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবসরের পর এমন উপলব্দি হয়তো অনেকেরই হয়েছে। তবু গ্রন্থাগারিক কোনো দিকপাল নয়। তা সত্ত্বেও প্যারিচাঁদ মিত্র থেকে নীহাররঞ্জন রায়েদের মতো দিকপালেদের উল্লেখ কাটা হল না এই কারণে যে তাঁদের পদার্পণে হলেও ইতিহাসবিদ্ তপন রায়চৌধুরীর কথা ধার নিয়ে বলতে পারা যাবে যে, পিদারম্ সুলতান বুদ --- অর্থাৎ মদীয় পিতাঠাকুর ছোলতান আছেলেন। পশ্চিমবঙ্গের সাতটি ৱিবিদ্যালয়ে প্রতি বছর যে শত শত ছাত্রছাত্রী গ্রন্থগার বিজ্ঞানের পাঠ নিতে আসেন বা নিয়ে যান তাঁদের পক্ষে শাখার এই বংশগৌরবটা কম কিছু নয়। এবং গোটা সমাজের নিরিখে এই ছাত্রছাত্রীরাও কম কিছু নন,কেননা সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এঁদের প্রায় সকলেই বিভিন্ন বিষয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রিপ্রাপ্ত। অবশ্য বংশগৌরবে যে ভবী ভোলে এমন প্রমাণও হাতে কিছু নেই। ইতিহাসে এম. এ. পাশ করা ছাত্রের মুখে যখন শুনি যে রোমিলা থাপার, সুমিত সরকার, ইরফান হাবিব - এর নাম তাঁর অজানা, বা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে দর্শনে প্রথম শ্রেণিতে বি.এ. পাশ করে কলকাতা ৱিবিদ্যালয় থেকে এম. এ. করে বিদেশি ৱিবিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বৃত্তির আবেদনকারী মৌখিক পরীক্ষায় যখন অকপটে জানান যে লোকায়ত- খ্যাত দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বা বিমলকৃষ্ণ মতিলাল -এর নাম তিনি শোনেননি, বা বিখ্যাত কোনো বাঙালি সাংবাদিককের নাম জানতে চেয়ে যখন কোনো ছাত্রের মুখে বর্তমান পত্রিকার সম্পাদকের নাম পাই, অনেক মাথা চুলকেও তাঁর সমকক্ষআর কোনো নাম উঠে আসে না, তখন সন্দেহ হয় প্যারিচাঁদ মিত্রদের নিয়ে কতদূরই বা আর যাওয়া যেতে পারে।পিতাঠাকুর ছোলতান থাকলেই বা কী আর না থাকলেই বা কী। অবশ্য এই পিতৃপরিচয়হীনতার অভিশাপ শুধু গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শাখায় বসবাসকারীদের প্রাপ্য নয়, সব শাখারই এতে সমান অধিকার। এবং দোষটা কোনো শাখার নিজস্ব নয় বা ছাত্রছাত্রীদেরও নয় --- দোষ আবহাওয়ার। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সবসময়ই কেমন ঘুম পায়, আর ঘুমের ঘোরে বাপঠাকুরদার নাম মনে রাখতে পাগলেও পারে না। তবু গ্রন্থাগারিকের মূল কাজই হল নাম মনে রাখা--- হয়. বইয়ের নাম না হয় লেখকের , কখনো বা বিষয়ের ---যে বিষয়নামকে আজকের কম্পুটারের ভাষার ডেসক্রিপ্টর বলা হচ্ছে। এইসব নাম মনে না থাকলে লিখে রাখতে হয়, সেটাই ক্যাটালগ, কখনো বা ইন্ডেক্স ।বিষয় থেকে নাম, নাম থেকে বিষয়। অনুসন্ধিৎসুকে নামের জোগান দিয়ে যাওয়াই হল গ্রন্থাগারিকের মুখ্য কর্তব্য । বাকি কাজ পাঠকের।

তাহলে গ্রন্থাগারিকের বিদ্যেবুদ্ধির দরকার কীসের ? এ কাজ তো পুস্তক বিক্রেতাও পারে। সে আলোচনায় আসার আগে বিদ্যেবুদ্ধির সংজ্ঞার্থটা জেনে নেওয়া জরি। প্রতিটি বিদ্যারই আলাদা আলাদা সংজ্ঞার্থ আছে ---পদার্থবিদ্যা কী, রসায়নবিদ্যা কাকে বলে, ভূগোলবিদ্যা কোনটি, ইত্যাদি সংজ্ঞার্থ কোথায় পাওয়া যায় গ্রন্থাগারিক তা জানেন। প্রতিটি বিষয়ের অভিধান খুঁজে তা বার করে দেওয়া যায়। গ্রন্থাগারবিদ্যারও তেমনই একটা সংজ্ঞার্থ আছে, কিন্তু সেই সংজ্ঞার্থটুকুই সব নয়--- তার বাইরেও সব বিদ্যার সঙ্গে তার একটা সংযোগ থাকে। এই সংযোগটা না রাখলে শৌলমারির সাধু নেতাজি কি না এই নিয়ে ধন্দে পড়েট্রে ত্নজ্জন্জ্জন্তুন্দ্বপ্তুন্ত ঢপ্পন্দ্মপ্সব্দদ্ধপ্সজ ? -এর সঙ্গে মিশিয়ে সব তালে
গাল পাকিয়ে যাবে। সেইজন্যেই গ্রন্থাগারিকের বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন, শুধু গন্থাগারবিদ্যার নয় --- শুধু বিদ্যার, শুধুবুদ্ধির।

এখন মুশকিল হল শুধু বিদ্যা বুদ্ধির সংজ্ঞার্থের সন্ধান পাওয়াটা দুরূহ। এ বিষয়ে কমলাকান্ত চক্রবর্তীর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো গতি নেই। কমলাকান্ত যে ভাষ্য দিয়েছিলেন তদনুসারে, বিদ্যা কি, তাহা অবধারণ করা কঠিন। কেহ কেহ বলেন, লিখিতে ও পড়িতে শিখাকে বিদ্যা বলে। কেহ কেহ বলেন, বিদ্যার জন্য বিশেষ লিখিতে বা পড়িতে শিখার প্রয়োজন নাই গ্রন্থ লিখিতে সম্বাদ পত্রাদিতে লিখিতে জানিলেই হইল। কেহ কেহ তাহাতে আপত্তি করেন যে, লিখিতে জানে না, সে পত্রাদিতে লিখিবে কি প্রকারে ? আমার বিবেচনায় এরূপ তর্ক অকিঞ্চিৎকর। কুম্ভীরশাবক ডিম্ব ভেদ করিবামাত্র জলে গিয়া সাঁতার দিয়া থাকে, শিখিতে হয় না। সেইরূপ বিদ্যা স্বতঃসিদ্ধ, তজ্জন্য লেখাপড়া শিখিবার প্রয়োজন নাই।

আর বুদ্ধি বিষয়ে কমলাকান্ত যে, যে আশ্চর্য্য শক্তিদ্বারা তুলাকে লৌহ, লৌহকে তুলা বিবেচনা হয়, সেই শক্তিকেই বুদ্ধি বলে। কৃপণের সঞ্চিত ধনরাশির ন্যায় ইহা আমরা স্বয়ং সর্বদা দেখিতে পাই, কিন্তু পরের কখনও দেখিতে পাই না। পৃথিবীর সকল সামগ্রীর অপেক্ষা বোধ হয়, জগতে ইহারই আধিক্য। কেন না, কখন কেহ বলিল না যে, ইহা আমি অল্প পরিমাণে পাইয়াছি।

সুতরাং এ জগৎ সংসারে, বিশেষ করে বঙ্গভূমে, সবারই যা আছে সেই প্রয়োজনীয় বিদ্যেবুদ্ধিটুকু থাকবে না এমনটা ভাবা মূর্খতা। সেই কারণেই্ সকল গ্রন্থাগারিকই বিদ্বান এবং বিদ্বানমাত্রেই গ্রন্থাগারিক হবার ক্ষমতা রাখেন। সেই কারনেই অনের গ্রন্থাগারিকই তুলাজ্ঞানে যে কোনো গ্রন্থাগারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন এবং নেবার পর লৌহজ্ঞানে সে দায়িত্ব এড়িয়েও চলেন। চাকরি জীবনের ধর্মই এরকম। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য গ্রন্থাগারিকের কাছ থেকে আর একটু বেশি কিছু দাবি করেছিলেন । তিনি চেয়েছিলেন গ্রন্থাগারিকের গ্রন্থবোধ। এই গ্রন্থবোধের ব্যাপারটা একটু গোলমেলে।

বোধের সঙ্গে বুদ্ধির একটা সম্পর্ক আছে ঠিকই, কিন্তু যেন মনে হয় বোধ জিনিসটা বুদ্ধিকে অতিক্রম করা কিছু। শুধু বুদ্ধিতেই কিন্তু অনেকদূর কাজ চলে যায়। শ্রদ্ধেয় ফণীভূষণে রায় তখন কলকাতার কমার্শিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক। একদিন এক তণ শিল্পোদ্যোগী তাঁর কাছে এসে জানতে চাইলেন, আচ্ছা, আপন

াদের শেক্সপিয়র রচনাবলি আছে ? ফণীদা তাঁকে সবিনয়ে জানালেন যে তা নেই। ভদ্রলোক কিছুটা ইতস্তত করে জানতে চাইলেন, আচ্ছা, এখানে গোলাপ ফুল নিয়ে কোনো বই আছে ? ফণীদা তখনও সবিনয়ে জানালেন, আজ্ঞে না। ভদ্রলোক তখন কিছুটা হতাশ হয়ে বেরিয়ে আসার মুখে। এবার ফণীদার প্রশ্ন করার পাল া। জানতে চাইলেন, আপনি ঠিক কীখুঁজছেন বলুন তো ?---- আজ্ঞে, আমি গোলাপ ফুল রপ্তানির ব্যবসা করি। জানতে চাইছিলাম গোলাপ ফুল নিয়ে শেক্সপিয়র কী লিখেছেন। লিটারেচরে ছাপাবার জন্য। ----ও তাই বলুন। বসুন আপনি। বলে ফণীদা তাঁর হাতে ডিকশনারি অফ কোটেশনস -এর অন রোজ চ্যাপটারটা খুলে ধরিয়ে দিলেন। ভদ্রলোকের তখন হাতে চাঁদ পাওয়ার অবস্থা । ঘটনাটা ফণীদার কাছেই শোনা।

এটা ফণীদার বুদ্ধির খেলা। সন্ধানী ভদ্রলোককে দেখে তিনি বুঝেছিলেন তিনি আর যাই হোন, শেক্সপিয়ার - প্রেমী কেউ নন এবং তাঁর পক্ষে গাছের চেয়ে গ াছের ছায়া সব রকমের ভালো হবে। তাছাড়া পাঠক-মনোযোগী হবারও এটা একটা দৃষ্টান্ত। গ্রন্থগার বিজ্ঞানী বারউইক সেয়ারস তাঁর প্রিয় ছাত্র রঙ্গনাথনের বইয়ের ভূমিকায় লিখেছিলেন, যখন লাইব্রেরিতে কাজ করার আগ্রহ নিয়ে তণেরা আমার কাছে আসে আমি প্রশ্ন করি --- তোমরা কি মানুষকে ভালোবাস এবং ম ানুষের সেবা করতে চাও? ফণীদার আচরণে তার স্পষ্ট উত্তর ছিল। যে কোনো ভালো গ্রন্থাগারে কাজ - করা গ্রন্থাগারিকের কাছে এ উত্তরটা থাকতে হয় এবং পরিষেবার এই ধরনটাও জেনে রাখতে হয়। কেননা তাঁরা জানেন গাছগাছলি শেকড় বাকড় মিথ্যে সবাই গেলে / বাপারে বলে পালায় ব্যামো ছায়ার ওষুধ খেলে। এই ছায়াগুলো আর কিছুই নয়, নির্দেশিকা, তথ্যপঞ্জি, টীকা, তথ্যসূত্র, গ্রন্থপরিচিতি, লেখক পরিচিতি, এমনকী বইয়ের বিজ্ঞাপন পর্যন্ত । এগুলো শিশিতে পুরেই গ্রন্থাগারিকের কারবার। আর শুধু গ্রন্থাগারিকই বা কেন, এই টোটকাসেবন করে কত লেখক বইয়ের পর বই প্রসব করে চলেছেন তার খবরও একটি বইয়ের তথ্যসূত্রে ভূল ছাপা হয়েছে তো তার ঔরসজাত আরও পাঁচটি গ্রন্থে একই ভূল বাহিত হয়ে চলেছে---- এ দৃষ্টান্তও বিরল নয়। তবে তা নিয়ে আলোচনা করাটা অনধিকার চর্চা। কিন্তু অধিকারের সীমাটা একটু না বাড়ালেও আবার গ্রন্থবোধের ব্যাপারটা ঝাপসাই থেকে যাবে।

রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থগারিকের কাছে গ্রন্থবোধের দাবিটা জানিয়েছিলেন, কিন্তু কোথা থেকে তা আসবে তার পথ বাতলে দেননি। বুঝে নেওয়া যায় যে, বোধ যখন, তখন তা ভেতর থেকেই জাগ্রত হবে, বাইরে থেকে আসতে দিলে সংক্রামণ ঘটতে পারে। কেননা বইয়ের বিপুল জগৎটাকে বাইরে থেকে যতটা পবিত্র মনে হয় ততটা পবিত্রতা হয়তো তার নেই। বহু বইই আসলে মলাটে মোড়া ছাপা কাগজ । অনেক সময় গ্রন্থকারই গ্রন্থবোধের প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠেন। যেমন ২০০২ সালে দুটি সংস্করণ হয়ে যাওয়া এক প্রবীণ কৃষকনেতা কর্তৃক লিখিত এক বইয়ের শুতেই বইটির যে স্বাক্ষরবিহীন পরিচয় দেওয়া আছে সেখানে বলা হয়েছে, গল্প নয়। ঘটনা অতিরঞ্জিত নয়। বাস্তব চিত্র।একটি থানা অঞ্চল । দশটা বছরের টুকিটাকি । ১৯৬৭-৭৭ । নামধামের পরিবর্তন হয়েছে। একটা অঞ্চলের ইতিহাস কই ? বীরত্বের কাহিনীগুলি ? ঐতিহাসিকেরা যোগবিয়োগ করবে। বানানো কথা লিখবে। প্রতিবাদ করার মতকেউ বেঁচে নেই। মালমশলা যাবে হারিয়ে। সোন ারপুরের আন্দোলন কি ? কথাটা এল কিভাবে ? সেদিনের সবলতা দুর্বলতা অত্যাচার সন্ত্রাস সবাই ভুলে যাবে। আগামী প্রজন্মের জন্য কিছু ইতিহাস কিছু সত্য ঘটনা থাক না । থাক, তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু গ্রন্থাগারিক এটিকে রাখবেন কোথায় ? খোয়াবনামা-র পাশে, না কি কৃষকসভার ইতিহাস-এর পাশে ? কিন্তু নামধ ামের যে পরিবর্তন হয়েছে! অথচ এটি গল্প নয় ! রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বুঝেছিলেন -- লাইব্রেরিয়ানের কাজটা মস্ত কাজ !

তা সত্ত্বেও গ্রন্থবোধটাকে ঝেড়েমুছে রাখতে হবে। সেটা কীভাবে সম্ভব ?
আগেই বলেছি. বুদ্ধির চেয়ে বোধ বড়ো , বোধের চেয়ে বোধি। বোধিলাভের জন্য বুদ্ধদেব ঘর ছেড়েছিলেন, চৈতন্যও । গবেষকরাও দেশ ছাড়লেন । গ্রন্থগা রিকদের অত বেশি কিছু করার দরকার নেই, কেননা তাঁদের দরকার বোধি নয়, বোধ। এর জন্য শুধু পরিশ্রম করাটানা ছাড়লেই যথেষ্ট। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন, লাইব্রেরিকে সম্পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য করে তোলবার চিন্তা ও পরিশ্রম লাইব্রেরিয়ান প্রায় স্বীকার করতে চায় না। এবং এর কারণ হিসাবে তিনি সঞ্চয় বাহুল্যের দ্বারা নিজেকে ক্লান্ত করা এবং সাধারণের মনকে অভিভূত করার কৌশলের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছিলেন। কথাগুলি আজ আরও বেশিভাবে প্রযে াজ্য। সরকারি দাক্ষিণ্যে বিপুল বই সঞ্চয় করে সুদৃশ্য গ্রন্থাগার ভবনের জনহীন কক্ষে চেয়ারে বসে গ্রন্থাগারিক ঝিমোচ্ছেন ----এ দৃশ্য একটু ঘুরলে অনেক গ্রন্থাগারেই প্রত্যক্ষ হবে। কথা বলেন শুনবেন সেইসব আক্ষেপ, লোক আজকাল পড়তে চায় না। অথচ মাদ্রাজ ক্রিসটিয়ান কলেজে গণিতের অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে আসা জাতীয় অধ্যাপক এস. আর. রঙ্গনাথন সেই ১৯৩১ সালেই তাঁর গ্রন্থগার বিজ্ঞানের পঞ্চ সূত্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূত্রে বলেছেন, প্রতিটি পাঠকের জন্য বই এবং প্রতিটি বইয়ের জন্য পাঠক।

গবেষণা গ্রন্থাগার বা বাণিজ্যিক গ্রন্থাগারগুলির কথা আমি ভাবছি না, কেননা সেগুলির ভাবনা তাদের ব্যবহারকারীরাই ভাববে। আমার বক্তব্য সাধারণ গ্রন্থগার নিয়ে। সামাজিক - সাংস্কৃতিক আলোড়নহীন একটা নিস্তরঙ্গ সমাজে যে মারী নামে তার প্রথম বলি হয় বই। সমাজে আলোড়ন তোলার জবরদস্ত কাজটা হয়তো গ্রন্থগারিকের পক্ষে দুঃসাধ্য, কিন্তু গ্রন্থাগার কক্ষে প্রাণের স্পন্দনটুকু বাঁচিয়ে রাখতে তিনি পারনে ; অন্তত পারা উচিত । প্রত্যেক লাইব্রেরির অন্তরঙ্গ সভ্যরূপে একটি বিশেষ পাঠকমণ্ডলী থাকা চাই। সেই মণ্ডলীই লাইব্রেরিকে প্রাণ দেয়। লাইব্রেরিয়ান যদি এই মণ্ডলীকে তৈরি করে তুলে একে আকৃষ্ট করে রাখতে পারেন তবেই বুঝব তাঁর কৃতিত্ব। এই মণ্ডলীর সঙ্গেতাঁর লাইব্রেরীর মর্মগত সম্বন্ধ স্থাপনের তিনি মধ্যস্থ । অর্থাৎ তাঁর উপরে ভার কেবল গ্রন্থগুলির নয়, গ্রন্থপাঠকের। এই উভয়কে রক্ষা করার দ্বারা তিনি তাঁর কর্তব্যপালন তাঁর যোগ্যতার পরিচয় দেন। কথাগুলি রবীন্দ্রনাথের লাইব্রেরির মূখ্য কর্তব্য অভিভাষণ থেকে নেওয়া -- --আমি বলব জ্ঞান দেওয়া হবে। গ্রন্থগারিক যদি জ্ঞান দেন তাহলে তিনি শিক্ষক, যদি শুধু বই ইস্যু করেন তাহলে কেরানি, যদি শুধু গ্রন্থসংগ্রহ ও সংরক্ষণের ক াজ করেন তাহলে কেয়ারটেকার । এর বাইরে যদি কিছু হতে চান তাহলে পরিশ্রম করাটা ছেড়ে বিকল্পের সন্ধান কন। পাঠক যদি বই পড়তে না চায় তো নোটবই পড়ান, নোটবই না চাইলে দলিল দিন, সেটাও না পড়লে নিদেনপক্ষে হস্তরেখা পড়ান। যদিও অনেক মনীষীরই স্বতঃস্ফূর্ততার কাছে আত্মসমর্পণ করায় আপত্তি থ াকে, তবু একালের অনেকেরই প্রিয় কবি বলেছেন, বিকল্পের কোনো পরিশ্রম নেই।

পরিশ্রমের সংজ্ঞার্থটাও অবশ্য কমলাকান্তের কাছ থেকেই জেনে নেওয়া দরকার ঃ উপযুক্ত সময়ে ঈষদুষ্ণ অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন, তৎপরে নিদ্রা, বায়ু সেবন, তাম াকুর ধূমপান, গৃহিনীর সহিত সম্ভাষন ইত্যাদি গুতর কার্যসম্পাদনের নাম পরিশ্রম।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com